রাজার দৃষ্টি উপেনের দুই বিঘা জমির ওপর

– ড. হাসনান আহমেদ

জীবন উপান্তে দাঁত পড়া, কোমর নুয়েপড়া অসংখ্য বন্ধুদের সারাদিনের সান্নিধ্য, হইচই কার না ভালো লাগে! বন্ধুদের সবাই অন্তত নানা-দাদা হয়েছে। মেয়ে-ক্লাসমেটদের সবাই নানি-দাদি ছাড়াও বুড়িমা হয়ে গেছে। আড্ডায় নাতি-পুতিদের নিয়ে গল্পই বেশি। প্রায় সবাই ডায়াবেটিস ও বুকের রোগী, কারো কারো জীবন রক্ষার তাগিদে বুক-ফাড়া পর্ব আগেই শেষ। বছর ঘুরতেই অনেকে জীবনের মায়া কাটিয়ে পরপারের অজানা গন্তব্যের যাত্রী হচ্ছে বলে নিত্য খবর আসছে। এমন প্রতিটা খবর নিজের রোজ-কেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এসব খবরে বন্ধুত্বের বন্ধন মজবুত হয়। শেষ-বয়সী বন্ধুদের জীবনের বেলাশেষে একসাথে অনেককে নাগাল পাওয়া নিতান্তই সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ গল্পদাদুর আসর বসাতে পিকনিকের নামে বিজয় দিবসের ক'দিন আগে গেলাম ঢাকার অদূরে আমিনবাজারের ব্রিজ পার হয়ে আরেকটু পশ্চিমে হাইওয়ে-সমতল কচিপল্লবিত, গাছগাছালিতে ভরা মধুমতি মডেল টাউনে। প্রজেক্টের উত্তর পাশ দিয়ে ঢাকা-আরিচা হাইওয়ে বয়ে গেছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে অসংখ্য বাড়িঘর, গাছগাছালিতে ঘেরা, আধুনিক সুবিধাসজ্জিত আবাসন, শেষ জীবনে মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই, ভালোলাগার মতো একটি জায়গা।

দেখে মনে হলো– কোথায় মডেল টাউন? এ তো জনবসতিতে ভরা আদর্শ গ্রাম! ভেতর দিয়ে অসংখ্য প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার দুপাশে গাছ সারি সারি; বনজ, ফলজ ও ঔষধি গাছপালা মিলে অগণন, লক্ষ লক্ষ। প্রজেক্টের মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিম আড়াআড়ি বয়ে গেছে পানি প্রবাহের প্রশস্ত ব্যবস্থা, লেক বললেও অত্যুক্তি হবে না, বর্ষা মৌসুমে বন্যার পশ্চিম-পাশের পানি পুবের বুড়িগঙ্গায় পার করে দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা। লেকের ওপর ব্রিজ দুপাশের জনবসতির সেঁতুবন্ধ রচনা করেছে। আমাদের একজন বন্ধু জীবনের শেষ ঠিকানা এখানে তৈরি করতে পেরেছে; সেটাকে আশ্রয় করে এ বুড়ো-সমাবেশের আয়োজন। এ বয়সে বিভিন্ন রোগে ভোগার কারণে খাবারের দিকে আকর্ষণ সবারই কম। গল্প ও দীর্ঘ বছর পর একে অন্যকে পেয়ে প্রাণখোলা আলিঙ্গনের ঘাটতি নেই। বিকাল হতেই কয়েক বন্ধুকে নিয়ে পুরো প্রজেক্টটা ঘুরেফিরে দেখলাম। এর আগেও এসেছি; এবার বুড়ো বন্ধদের সাথে নিয়ে বেড়ানোর মজাটাই আলাদা। একটা দোকানে বসে চা খেলাম। চায়ের তপ্ত ঘ্রাণে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। জীবনের প্রতিটা পর্বেই নতুনত্বের পরশ, নতুনের সন্ধানে চিরনতুনের অবিরাম অভিসার। ঘটনার বর্ণনা দিতে জীবন দর্শন আওড়াচ্ছি।

হঠাৎ চমকে উঠলাম গত ২১ ডিসেম্বর মধুমতি টাউনের সামনে মানববন্ধনের ছবি সম্বলিত পত্রিকার খবর পড়ে, যমুনা টিভিসহ অন্যান্য টিভি-পর্দায় সচিত্র সংবাদ দেখে। ভাবলাম, এখানে বসবাসরত পুরুষগুলো কী এমন অকূল পাথারে পড়লো যে, এই শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে ছোট-মাঝারি বয়সের ছেলেমেয়েসহ পরিবার-পরিজন নিয়ে মানববন্ধনের নামে সারিবদ্ধ হয়ে ব্যানার হাতে রাস্তার পাশে দাঁড়াতে হলো! 'তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল, বাহিরে যবে হাসির ছটা, ভিতরে থাকে আঁখির জল'। পিকনিকের দিন বুঝতে পারিনি, এত লীলা ও ভোগান্তি এর মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সামাজিক ভোগান্তি ঘুরেফিরে সাধারণ মানুষের, প্লট-ক্রেতাদের কাঁধে। রাজউক 'মধুমতি মডেল টাইন' উচ্ছেদ করতে চায়। 'জলাভূমির পরিবেশ গড়তে' ঢাকার অদূরে গড়ে ওঠা প্রাকৃতিক পরিবেশসমৃদ্ধ অনুপম আবাসন প্রকল্প ধ্বংস করতে চায়। এরা তো সরকারি জমি জাল দলিল করে দখলে নেয়নি। কিস্তি আকারে টাকা দিয়ে বৈধ আবাসন কোম্পানির কাছ থেকে জমি কিনেছে। কোম্পানিও কোনো খাস জমি দখলে নিয়ে মাটি ভরাট করে বিক্রি করেনি। বরং ২০০৭ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন– পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, তিতাস গ্যাস এন্ড ট্রান্সমিশন, ঢাকা ওয়াসা, পল্লী বিদ্যুৎসহ সরকারের অন্তত ৮টি বিভাগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছাড়পত্র দিয়েছিল। মূলত এসব দেখেই ক্রেতারা প্লট কিনেছিলেন। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার নাকি এদেশের সাংবিধানিক অধিকার! এতে ক্রেতাদের অপরাধটা কোথায়? আজব দেশ বটে! মধুমতি মডেল টাউন ছাড়াও হাইওয়ের দু-পাশ বেয়ে সাভার পর্যন্ত অসংখ্য জায়গায় নিচু জমিতে মাটি ভরাট করে উপশহর গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের পাশেই মাটি ভরাট করে গড়ে উঠেছে ডেসকো এবং তিতাস গ্যাসের সুবিশাল পাওয়ার ও গ্যাস বিতরণ কেন্দ্র। সেসব জায়গায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আবাসন কর্তৃপক্ষের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। যত বিপদ মধুমতি আবাসনে প্লট ক্রেতাদের ঘাড়ে। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সমাজকর্মই আমার ধর্ম; তাই এ লেখা।

ঢাকা শহরের চারপাশ জলাভূমি, নদ-নদী-খালে ভরা। ভরাট না করলে বসতবাড়ি গড়বে কীভাবে? এত নদ-নদীর খাস জমি দখল করে দিনে দিনে সময়ের পরিক্রমায় ভরাট হয়ে চোখের সামনে বড় বড় বহুতলবিশিষ্ট ইমারত গড়ে উঠলো। খাস জমির অবৈধ দখল বৈধ হয়ে গেল। একথার উত্তর কী? তখন পরিবেশবাদীরা কোথায় ছিলেন? আমি 'রাজউক' শব্দের মধ্যে 'রাজা' শব্দের গন্ধ খুঁজে পাই। নিজের নিচু-জমি মাটি ভরাট করে আবাসন গড়লেই আইনের শত ফাঁক-ফোকর, মারম্যাচে ঘোল খাইয়ে 'রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'। এখানে কমপক্ষে সাড়ে তিন হাজার প্লট আছে। বড় জোর একশ প্লট ধনী পরিবারের হবে। বাকি প্লট সবই ঢাকায় চাকরি করতে আসা চাকুরে কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ছা-পোষা মানুষের মাথা গোজার একটু ঠাঁই তৈরির জন্য ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মাসে মাসে কিস্তি দিয়ে জীবনের শেষ অবলম্বন গড়ার চেষ্টা। আবাসন প্রকল্পের মালিকের কাছে শোনা কথা: বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, নানা অজুহাতে সরকারের বিভিন্ন সেক্টর আবাসন প্রকল্পের অনুমতি নিতে গাদা-গাদা টাকা মালিক পক্ষ থেকে সুকৌশলে আত্মসাৎ করেছে। এভাবেই ঢাকা শহরের আবাসন গড়ে উঠেছে। ঢাকা শহরে এত কিছু হয়েছে, তবুও এ প্রজেক্টের শেষ অনুমতির কাজটা হয়নি। নিশ্চয়ই আবাসন-পক্ষ আটকপালে, এদেশের বাতাস বোঝে না; হয়তো যথাযথ জায়গায়, যথাসময়ে, যথাপরিমাণ দেনা-পাওনা মেটানো সম্ভব হয়নি, তাই। এজন্য রাজউকের খড়্গ এখনো মাথার ওপর ঝুলছে।

দূর অতীতে আমরা গুলশানের পূর্ব-পার্শ্বে বাড্ডা এলাকা সুদীর্ঘ বছর অননুমোদিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। তারও সদ্‌গতি একদিন হয়েছিল। কারণ ঢাকা শহর বিস্তারের কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশ বছরের স্মৃতি আমাকে নাড়া দেয়। শহরের চারপাশ বিল-খাল, নদী-নালা, জলাশয়ে ভরা ছিল, নৌকা ছাড়া চলা যেত না। সবই ভরাট হয়ে শহরে রূপ নিয়েছে। এর বিকল্পও ছিল না। অনেকেই

আইন মেনে করেনি। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ মানবিক ও আইনগত বাধা। এ শহরের সব আবাসন প্রকল্পের আইনগত সমস্যা 'ম্যানেজড' হয়ে গেল; এতে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হলো না, অথচ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির ('বেলা') বিদঘুটে-লুকানো শতেক আইনের মারপ্যাচে শেষতক এসে মধুমতি মডেল টাউনের 'ভাঙা পা খালে পড়লো'। শিক্ষাঙ্গন মাস্টারসাহেবদের দখলে থাকাটাই স্বাভাবিক। সেমতো কোর্ট-কাচারি-আইন 'পরিবেশ আইনজীবী সমিতি'র অধিকারভুক্ত হওয়ারই কথা। তাদেরকে বশে না এনে আবাসনের পরিবেশ বিষয়ে অনুমতি পাওয়া আকাশকুসুম কল্পনা বই আর কিছু না। এ ভুল আবাসন-প্রকল্প কোম্পানির। অবশেষে এতে আবাসন প্রকল্পের মালিকপক্ষের তেমন কোনো ক্ষতি নেই, তারা তাদের জমি টাকা বিনিময়ে বিক্রি করে নিরুপায় হয়ে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। ক্ষতি 'ব্যাঙের আধুলি'র ধারক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের, যারা এ প্রকল্পে জমি কিনেছে। এটাকে প্রকৃতির নির্মম পরিহাস না বলে 'অভাগা ছা-পোষা কাঙাল যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়' দশা বলাই যথোপযুক্ত। এটা 'পরিবেশ আইনজীবী সমিতি'কে বুঝতে হবে; আইন তো তাদের হাতেই ঘোরেফেরে। অনেকেই জমিতে টাকা ব্যয় করেছে পনেরো-বিশ বছর আগে। কত সৌভাগ্য! এতদিনে পুরোটাই এখন লোকসান যেতে বসেছে। হাজার হাজার সাধারণ পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হতে চলেছে। সাধারণ মানুষ জমি কিনেছিল মধুমতি মডেল টাউন বৈধ কোম্পানি কীনা, তা দেখে। জমি রেজিষ্ট্রি করে, নাম পত্তন করে খাজনা দেওয়াও চলছিল। হঠাৎ 'সাজানো ফুলের বনে ঝড় বয়ে গেল'।

এ প্রকল্পের চার বর্গকিলোমিটার জমির মাটি উঠিয়ে ফেলে জলাভূমি না তৈরি করলে ঢাকা শহরের 'পরিবেশ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা' (?) দেখা দিচ্ছে। রাজউক বিশ হাত মাটি উঠিয়ে নিয়ে একজনের জমি জলাভূমি করে দিল। তিনি তার জমিতে আবার বিশ হাত মাটি ভরাট করে আবার বাড়ি তৈরি করলেন, গাছ লাগালেন, কারো কোনো কিছু বলার আছে? তার জমিটা নিতে গেলে সরকার বর্তমান বাজার দামের কমপক্ষে দ্বিগুণ দামে জমিটা অধিগ্রহণ করতে হবে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে অধিগ্রহণ করে সরকারের কী লাভ? বরং হাজার হাজার পরিবারকে ঘরছাড়া করা হবে। সরকার সুস্থ চিন্তা করলে নিশ্চয়ই তা করবে না। একটি বেসরকারি পরিবেশ সংস্থার প্ররোচনা ও মামলার প্রেক্ষিতে এ নিদারুণ ও অবাস্তব বৈষম্যের শিকার এ আবাসন প্রকল্পের সব প্লটহোল্ডার।

এত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন, তবুও বৈষম্যের অপনোদন হচ্ছে কই? এর শেকড় অনেক গভীরে। সাধারণ মানুষের হতাশা আর কীভাবে আসতে পারে! 'বেলা' কর্তৃক প্রকল্প এলাকাকে বন্যাপ্রবাহ এলাকা হিসেবে প্রচার করে আদালতকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, বন্যাপ্রবাহ এলাকার দাবি আদৌ সত্য নয়। উক্ত মৌজার কোনো জমির রেকর্ডপত্রে এবং পর্চায় বন্যাপ্রবাহ এলাকা বলে ঘোষণার কোনো উল্লেখ নাই। এমনকি সিএস, আরএস পর্চাসমূহে সুস্পষ্টভাবে জমিগুলো ব্যক্তি-মালিকাধীন নাল জমি হিসেবে রেকর্ডভূক্ত হয়েছে। রাজউকের ওপর নির্দেশনা মতে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য হাজার হাজার গাছপালাসমৃদ্ধ আধুনিক গ্রাম– এসব কেটে ফেলে পনেরো-বিশ ফুট মাটি তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এ এলাকায় অপ্রয়োজনীয় 'পরিবেশ রক্ষা'র নামে প্রয়োজনীয় গাছপালা কেটে, মাটি অন্য কোথাও দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিবেশ বাঁচাতে হবে। এতে জমি-ক্রেতাকে হাজার হাজার কোটি টাকা অধিগ্রহণ বাবদ দেওয়া এবং হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে মাটি কেটে সরানোর

উপকারিতা কী? সরকার কস্ট-বেনিফিট এ্যানালাইসিস নিশ্চয়ই করবে। শুধু সাড়ে তিন হাজার পরিবারকে ঘরছাড়া ও ভিটেশূন্য করার মধ্যে কি শান্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, আমার চিন্তার বাইরে। অনেক দূর থেকে বালি ও মাটি এনে ঢাকার চারপাশ ভরাট করে আবাসন গড়ছে, কেবল এখানেই শুনলাম, রাজউকের প্রতি আদেশ হয়েছে চার বর্গকিলোমিটার উঁচু এলাকার মাটি ও গাছ কেটে জলাভূমি তৈরি করতে হবে। কত অবাস্তব আদেশ-নির্দেশ। শেষ বয়সে এসে এমন উদ্ভট কাণ্ডকারখানার পরিকল্পনা আর কত দেখবো! জানিনা, কেন এত বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ড। ঢাকা শহরের চারপাশ সরকারি আবাসিক প্রকল্পসহ শত শত বেসরকারি আবাসিক প্রকল্প নিচু জমি ভরাট করেই চোখের সামনে আবাসন গড়ে উঠলো। আইন-কানুনের মারপ্যাচ শুধু মধুমতির ভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে পরিণত করলো। হাজার হাজার মধ্যম আয়ের ছা-পোষা মানুষের 'নিজের বাড়ি' নামের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পরিণত হতে চলেছে। সবই পরিবেশবাদী আইনজীবী ও কর্তাবাবুদের মর্জি।

অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়টা সুরহা করতে কোনো সহযোগিতা করতে পারে কীনা? আমি অনুরোধ করবো বর্তমান পরিবেশ উপদেষ্টা, যিনি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফসল, প্রধান উপদেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন প্রকল্পটা ঘুরে দেখে আসুন। ইতিবাচক কিছু করার থাকলে করুন। এত বিশাল চার বর্গকিলোমিটার জমির মাটি সরকারের টাকা ব্যয় করে সরিয়ে ফেলা কি সম্ভব? লক্ষাধিক গাছ কেটে ফেললে, সাধারণ মানুষকে বিনা প্রয়োজনে উৎখাত করলে কি পরিবেশের ক্ষতি হবে না? 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের' আইন ও এর প্রয়োগ এদেশে কোথায়?

(২৬.১২.'২৪ দৈনিক শিক্ষা বার্তা এবং ২৭.১২.'২৪ দৈনিক মুক্তবাংলা পত্রিকায় মতামত কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদঃ সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
Web: pathorekhahasnan.com